আমারই গল্প, আমারই কার গল্প?

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

১।।

গল্প হাঁটে তার নিজের মত করে। হাঁটে ঘোরে নড়ে বেড়ায়। অন্ধকারে আলোর মত, না, ভুল বললাম, আলোয় অন্ধকারের মত, গল্প বুকের খাঁচার থেকে মন কেড়ে নিয়ে যায়। কোথায় যায়?

একজন কারাপ্রধান, বাংলায় যাকে বলে জেলার, তার প্রাচীন বিদ্যোৎসাহিতায়, বা, আর কিছু করার ছিলনা বলে, আরকিওলজির চর্চা করত। খুব মনপ্রাণ দিয়ে সে চেয়েছিল, খুঁজে পেতে, একটা প্রাচীন ইতিহাস। অত চাইলে মানুষ কী না পায়? ভগবান তো সহজ কথা, লেনিন 'বলে একটা বিপ্লবই পেয়ে গেছিলেন।

সাধনায় উন্মাদ, তপঃক্লিষ্ট জেলার একদিন আইন ভাঙতেও পিছপা হয়না। কারাগারের বন্দীদের গিয়ে বলে, তোমরা খোঁড়ো, খুঁড়তে শুরু করো। খোঁড়ো, আর খোঁজো, খুঁজে তোমাদের পেতেই হবে, প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। হয়তো সে গিয়ে বলেছিল, ম্যায় আংগরেজ জমানে কা জেলর হুঁ, এভাবেই আমাদের সব ঐতিহ্য নির্মিত হয়েছে, কোনো আংগরেজ সেনাপ্রধান, মার্শালের হাতে। হয়ত সেই মার্শাল, কাজের সুবিধার্থে, সঙ্গে দু এক পিস লোকাল রাখাল ও নিয়েছিল। আজ সেই রাখালের নাম উঠে গেছে কত বিলেত থেকে ছাপা বইয়ে অব্দি।

বন্দী মানুষেরা এমনিতেই খুঁড়তে ভালোবাসে। হয়ত, খোঁড়ার, গর্ত করার, ক্রিয়ার ভিতর রয়ে যায় যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফেরত গিয়ে আদিম প্রাগ-ইতিহাস আরামে শরীর ভাসিয়ে দেওয়ার আকাঙ্খা। বা হয়ত ভাবে, এভাবেই একদিন পালিয়ে যেতে পারবে। সদ্য ক্লাস-পালানো শেষ করা বন্দী কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টোকে বাস্তিল-পালানোব হদিশ দিয়েছিল এক বৃদ্ধ, সারাজীবন যে শুধু খুঁড়ে গেছে। আর এই বন্দীদের আসরানি জেলার তো আগেই জানিয়েছে, যদি একবার খুঁজে পেতে পারো তো, তুমহে খুললা ছোড় দিয়া যায়গা, পোস্টকলোনিয়াল কানুন ভেঙেই।

তাই তারা খুঁজে পেতে শুরু করলো। গল্পরা যেখানে বুকের খাঁচার থেকে খুলে মন নিয়ে যায়, সেখান থেকে আসতে শুরু করলো রাশি রাশি প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ। এক নদী, এক সমুদ্র, তাকভর্তি থরে থরে আর্কিওলজি। এক মিউজিয়াম, দুই মিউজিয়াম, কত, কটা মিউজিয়াম বানাবে তুমি, আইএমএফ সাহায্যলব্ধ তোমার কেন্দ্রীয় বাজেটে?

তারা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। দোকানে দোকানে ফুটপাথে ফুটপাথে। সম্রাট অশোকেরও আগের আমলের টায়ার কেটে চটি বানানো শুরু হল পামার বাজার বস্তিতে। আর নাইলনের সুতো বার করে নিয়ে দড়ি।

কথা বলা বটগাছের ওপারে,ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীর দেওয়া ঠিকানায়, গল্পের অন্ধকারের দেশ থেকে আসা প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষেরা মুছে ফেলতে শুরু করে চারদিক। কোনোদিন কারো মাথার চারপাশে ঘুরতে থাকা একটুকরো অন্ধকার যে রহস্যের উৎসবে নেমন্তন্ন করেছিল, তার বাজনার রেশ বয়ে যায় যোজন যোজন, রবাহূত হয় আরো নানা টুকরো অন্ধকার।

উল্টোডাঙ্গা মোড়ে বৃদ্ধ ফেরিওলার চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম, বাদলার দিন, একটা বেলুনও বিক্রি হয় নাই গো আজ। একটি লুম্পেন, যার লুম্পেনতার গভীরেও একটা অসহায়তার গল্প রয়ে যায়, কিশোরই বলা যায় যাকে, যার লাল বা গেরুয়া বা সবুজ বা হয়তো সাদা রঙের সেমিরাজনৈতিক যৌনাঙ্গ আজকাল প্রায়ই প্যান্ট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে অন্যের পিছনে, গলার শির ফুলিয়ে জিগেশ করেছিল, ভিআইপির মোড়ে তোর বেলুনের

দাম কি আজকাল তুই ঠিক করছিস নাকি? তার চোখে, দশ পয়সা দামে বেলুনটি নেওয়ার পর, বিজয়ের কী গভীর উল্লাস। তুই এখনো বড় বাচ্চা আছিস রে খোকা, একজনকে এইটুকু মাত্র বেদনা দিয়েই এখনো তোর এত উল্লাস হয়? তালেবর হতে এখনো তোর ঢের বিলম্ব, ইকনমিক্সের ভাষায় এফিশিয়েন্ট।

একটি অসহায়তা এবং একটা মাতলামির গল্প নামে একটা লেখা, গল্প — হ্যাঁ, গল্পই, বেরোলো জোরালো তৎসম শব্দ খচিত নাম নিয়ে, সম্পাদক তাই চেয়েছিলেন। সেই সম্পাদক লোক হিশেবে বেশ ভালো ছিলেন, প্রায়ই দিতেন অনেক কিছু, টাকাপয়সা, বা আমার গদ্যে আমার ফুকোকে নকল করার প্রবণতা বিষয়ে নিষেধমূলক তাঁর মতামত। ফুকোর তখনো, বোধহয়, নামটা ছাড়া আমি কিছুই পড়িনি। তাতে কোনো গোলযোগ হয়নি, কারণ তিনিও পড়েননি, পড়েননি এমনকি আমার লেখাও।

সেই সম্পাদককে কি বলে উঠেছিলাম, ও ছাড়া আর কীই বা থাকে লেখায়, আমার লেখায়, হয় অসহায়তা, আর নয়তো মাতলামি। অসহায়তার বেদনা আর মাতলামির উল্লাস। রাইটিং অ্যাজ ডেভিয়ান্স। ইচ্ছা না-পূরনের বেদনা আর ইচ্ছাপূরনের ফ্যান্টাসি।

ইউরোপের ইহুদি নিধনের, পোগ্রমের, শ-শ বছরের ইতিহাসে, নাজি জর্মনের ইহুদি ঘেটোয় ঘেটোয় জায়নিস্ট প্রতিরোধের প্রায় একমাত্র আকার ছিল মাটিখোঁড়া, মাটির নিচে নিচে সুড়ঙ্গ বানিয়ে চলা, প্রায় একমাত্র স্বাধীন বিচরণভূমি ছিল শহরের রাস্তার নিচে নিচে নর্দমা আর পয়ঃপ্রনালী। বাঁচতে তো হবেই, ইঁদুরের মত হয়ে হোক, বা সরীসৃপের, বাঁচতে তো হবেই। কোথায় পড়েছিলাম, পড়েছিলাম নাকি লেখাটার মত এই এপিসোডটাও বানাচ্ছি, সেই বুড়োবুড়ির কথা, যারা গ্যাস চেম্বারের আহ্বানে চলে যাওয়ার আগের মূহুর্ত অব্দি খুঁড়ে গেছিল ঘেটোয় তাদের আবাসের সম্পূর্ন নিচেটা। রান্নাঘর থেকে পায়খানা। আর খুঁড়ে তোলা মাটি জমিয়ে তুলেছিল তাদের শোবার ঘরে আর ভাঁড়ারে। অভ্যাস?

রানুর ছেলে, বাড়ি থেকে বেরোনোর আর বাড়ি ফিরে আসার সময় রোজ দেখি, মাটি খোঁড়ে। স্বতঃসিদ্ধ ওর নিঃসঙ্গতা এবং বন্ধুহীনতায় — ওর বাড়ির লোকেরাই বা আর ওকে কত সময় দেবে — সাতবয়স্ক ভাইটালিটি বিকিরণ করে মা মৃত্তিকায়। আর ওর মাসি শানু বসে থাকে, রেলিং-এর গেটের পাশে টুলে। পড়াশুনো শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন, এবং বিয়ে হচ্ছেনা। রোগা হয়ে যাচ্ছে শুধু। আর কোনো চেনা মেয়ের বিয়ে হলেই, যদি সে রোগা হয়, শানু বলে, কী রোগা, আমার চেয়েও রোগা।

ওই বুড়োবুড়ির মত আমিও কি অন্ধকার খুঁড়ি অভ্যাসে? আর কিছু করার নেই বলে? অথবা এটাও আমার প্রতিরোধ? আর কীই বা পারি — মাটি খোঁড়া ছাড়া? ওই বুড়োবুড়ির মত খুঁড়েই চলব গ্যাস চেম্বারের ডাক আসা অব্দি? ডাকটা কে দেবে? এখানে তো নাজি নেই, আরএসএস? পারবে কী আর আরএসএস গ্যাস চেম্বারের ডাক দেওয়ার মত বড় হয়ে উঠতে? একানববইতে ভয় পেয়েছিলাম, লেখা লিখেছিলাম যৌনাঙ্গ সচেতন আদবানিকে উৎসর্গ করে, আপামর ভারতবাসীকে (পুং) লিঙ্গমুণ্ডচেতনা দিচ্ছেন আদবানি — আমরা প্রত্যেকে নিচু হয়ে হয়ে দেখছি, আপনি আমারটা, আমি আপনারটা, সবাই সবারটা — চর্ম আবরণী আছে না নেই। এখন মনে হচ্ছে বাড়িয়ে ভেবেছি, এই একশো কোটি প্লাস ভারতবাসী, অন্ততঃ পঞ্চাশ কোটি লিঙ্গবান, তাদের প্রত্যেকের লিঙ্গ পরীক্ষণ এবং চর্মহীনদের লিঙ্গ তথা শরীর হীন করে দেওয়া — সে বড় বিশাল প্রোজেক্ট, অত আরএসএস শাবক আদবানি পয়দা করবেন কোথা থেকে?

এই প্রতিরোধ তাহলে কাকে? জানিনা। উত্তম পুরুষে লেখার এই ঝামেলা। এটা কাহিনীর প্রোটাগনিস্ট বললে মানিয়ে যায়। কিন্তু নিজে? তাহলে লিখি কেন? কে জানি একবার বলেছিল, এই প্রশ্নটার দিকে তাকাতে নেই।

এই প্রশ্নটার দিকে না তাকালেও এই লোকগুলোর দিকে, আমার চারপাশে সবার দিকে, যাদের দেখতে পাই বলে আমি নিজেকেই দেখতে পাই, তাদের দিকে? মাখের একটা বই আছে আমার ঘরে, কোথা থেকে কবে এসেছে মনেও নেই, তার মধ্যে একটা ছবি — মাখ তার নাক দেখছেন, মাখ কেন আমরা সবাই, আসলে তো দেখতে পাই শুধু আমাদের নাক। তাও তো আমার চোখ ট্যারা, উঁহু, লক্ষ্মীট্যারা, হয় দেখতে পাই আমার ডান-নাক, মানে নাকের ডানদিক, অথবা বাঁ-নাক, একসাথে দুটোকে পাই না। নাকি সবারই তাই হয়? কে জানে? এরকম কত অজানাই রয়ে যায়। বিএসসি বয়সে এসে জেনেছিলাম, মানুষ একসাথে তার দু-চোখেই দেখে, আমি তো চিরকাল দেখে আসছি হয় আমার ডান চোখে, নয় বাঁ।

নিজেকে নাকের চেয়ে বেশি দেখতে পাওয়ার চেষ্টায় যাদের দিকে তাকাতে হয়, তাদের অন্ধকার, টুকরো টুকরো দেখায়, ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, গল্প গজায়। গল্প আবার তার নিজের গতিতে টেনে আনতে থাকে আরো নানা টুকরো অন্ধকার। মাথার মধ্যে ভিড় করে কথা বলা পাখিরা। গল্প তখন মানুষ খোঁজে। এই লেখাটা — এরকম আরো নানা লেখারা হয়ে যায় বাণীদার গল্প, রানুর ছেলের গল্প, ওর তো নামটাও জানিনা আমি। আমার যখন কষ্ট হয়, যখন বাসে দাঁড়িয়ে বোকা ক্যাবলা গরিব বৌয়ের টাকা হারিয়ে ফেলে, তাও আবার অন্যের টাকা, হাউ হাউ কান্না দেখতে দেখতে টের পাই, আমার সমস্ত রক্ত একসঙ্গে বদলে গেল, তখন কী করার থাকে আমার? হাত পা ছোঁড়া? কী ভাবে ছুঁড়ব? আগে তবু আরো দু-একটা উপায় জানতাম, আজকাল তাও ভুলে গেছি। লেখা ছাড়া আর কিছু তো পারিনা।

হ্যামলেট ওয়জ উইদিন দি মোর্নিং টাইম হোয়েন হি মেট দি গোস্ট। দি টাইম অফ বিমোনিং দ্যাট সেলিব্রেটস দি ডেথ অফ দি ফাদার ইন দি সরোজ অ্যান্ড ওয়েইলজ অ্যান্ড ল্যামেন্টজ। ইট ইজ এ ফেস্টিভাল দ্যাট ইজ নিগেটিভলি ডিফাইন্ড — দি প্রোডিগাল লাস্ট ইন ডিজগাইজ।

আমিও কি সেরকম সেলিব্রেট করছি? যেমন, শোনা যায়, মানুষ কান্না দেখতে ভালোবাসে? আবারো বলার থাকে, জানিনা। শেষ অব্দি গল্প থাকে। আর কিছু থাকেনা, গল্পকারও না। এই প্রসঙ্গে আর না, সেই সম্পাদক আমায় আমার বিপদের সময়ে অনেকগুলো দিনের থালার ভাত জুটিয়েছেন, তার এটুকু কথা মানা উচিত। আর, আর কত? লেখাটা শুরু হয়েছিল বোরহেস ঝেড়ে। বোরহেস আর শোলে। তারপর লিওঁ ইউরিস আর মাখ। দুতিনখানা বাক্যে জীবনানন্দ তো আছেই। আছে নিজেরই পুরোনো লেখা থেকে। তার চেয়ে রুবিদার কথা পাড়া যাক। গল্প যাকে খুঁজছে।

২।।

আমেরিকা, আমেরিকা, সবকিছুতেই আমেরিকা, সবকিছুই আমেরিকা — মনে মনে এরকম একটু বিড়বিড় করার পরই মনে হয়, অ্যাঁ, আমেরিকাটা যেন কী? কথাটাই কেমন অদ্ভুত শোনায় কানে — কোনোদিন শুনেছি আগে?

এই মুহূর্তে এসব ভাবার আর সময় কই? চারুর মা আসার অপেক্ষা, সেই কখন থেকে বসে আছে, আজ একটা এসপার কি ওসপার করে ছাড়বে — শরীরের জ্বালা যেন কমতে চায়না।

— না, সরি, এটা তো শানুর। এর আগে বাণীদা, যার সঙ্গে এখন একত্রিত হয়ে যাচ্ছে শানু, রানুর ছেলে এবং আরো কতজন, এই লেখার সিন্থেটিক স্পেসে। যেখানে বাণীদা আর বাণীদা

থাকছেনা, শানু থাকছেনা শানু। দোস্ত দোস্ত না রহা, পেয়ার পেয়ার না রহা। শুধু সুনীল দত্ত পিয়ানো বাজানোর ভান করে যাচ্ছে। আমার ভুমিকা দর্শকামুকের, ভয়ারিস্টের, আমি খুঁজছি, খুঁজে যাচ্ছি জিগ-স পাজলের নানা টুকরো। কিশোররা যেমন পাতা উল্টে উল্টে খোঁজে এমিল জোলার নানা, কাউন্ট মুফতের সামনে নানার সেই ডিসপ্লেটা কত পাতায় ছিল যেন। কোনটা যেন কিসের সাথে মিলে যায়, এখুনি খুঁজে পেয়ে গেলাম। আবার পরপর দুতিনটে মিলের আকস্মিক কোনো সমাপতন হয়তো বদলে দিল গোটা খোঁজাটাকেই।

বাণীদা গল্প করেছিল ওর দাদার কথা। সেদিন কি রক্তে মদ ছিল? মনে নেই। কিন্তু পুরো ছবিটা ভরগ্রস্থ ধোঁয়া ধোঁয়া। কলেজস্ট্রিট মার্কেটের নিচের তলায় একটা ঘর, দোকানঘর। ভিতরে কোনো আলো নেই। বাইরের দিকে লাগানো একটা ইলেকট্রিক বাল্ব, রান্নার ধোঁয়ায় ঘোলাটে, তার আলোটা ঘুরপথে, কালি আর ময়লাপড়া দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে ক্লান্ত। শুধু অবয়ব। ডিটেইলস আর বোঝা যায়না, কোনো কিছুর, বা কারোর, বাণীদার বা আমার বা অনুপস্থিত গণেশ পাইনের। বাণীদা আমায় বলল, এই যে, এইখানে রোজ গণেশ পাইন বসে। বসে তো কী? কেনই বা বলল? তারপর কী করেই বা কথা গিয়ে পৌঁছল ওর দাদার প্রসঙ্গে? সবটাই ঘোলাটে, ওই আলোর মত।

কী হবে সেই ঘোলাটে ডিটেইলসে? সেই বানাতে তো হবেই। তার চেয়ে যাওয়া যাক সেই ফিল্মস্ক্রিপ্টে., যেটা গজিয়ে উঠতে শুরু করেছিল এই রেফারেন্সে। গণেশ পাইনের প্রসঙ্গে বাণীদার ওই দারিদ্র, বা যা আমার দারিদ্র বলে মনে হয়েছিল, তার আগে বারবার জাহাজের প্রসঙ্গে অতীনের রেফারেন্স, সেইসময় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বেশ নাম করেছিল, অতীন বেশ একটা নাম, বাণীদার জন্যে আমার খারাপ লাগছিল।

এই পুরোটা কি সত্যিই ঘটেছিল? নাকি গজিয়ে উঠেছে আমার মাথার ভিতরেই? যে কারণে, পুরো ছবিটায় ওই নেশা নেশা অস্পস্টতা — হয় মদের নয় গাঁজার। কিন্তু ওই দারিদ্রটা, যেখান থেকেই আসুক, চিত্রনাট্যটার একটা ইম্পর্টান্ট এলিমেন্ট। পরিকল্পিত ওই বিশাল বাড়িটার চারপাশে ছড়ানো অনেকটা খোলা জমি, শ্রমিকদের ঝুপড়ি, একসময়ে সল্টলেকে যেমন ছিল। আর ডলারে রোজগার যদি ডলারেই খরচ হয়, তার মধ্যে তেমন নাটক নেই, যেমনটা আছে ডলারের আয় টাকায় খরচের ভিতর। আমেরিকা তো আমেরিকা হয়ে ওঠে এই তৃতীয় বিশ্বেই।

গ্র্যান্টস কোলোনিয়াল অ্যাজ দি পার্শিয়াল ইমিটেটর, মেকলেজ ট্র্যান্সলেটর অ্যান্ড নইপলজ কোলোনিয়াল পলিটিশিয়ান — অল পার্ট-অবজেক্টস অফ এ মেটোনিমি অফ কোলোনিয়াল ডিজায়ার। কোলোনিয়াল মানুষ নকল করত, ভাবা লিখেছিল, এটা তাদের ফ্যান্টাসি। এই মিমিক্রি তার গঠনগত ভাবেই ইনটারডিকটরি, নিষেধমূলক। দিস ডিজায়ার টু বিকাম হোয়াইট ইজ এ স্ট্রাইকিং ফিচার অফ দি ব্ল্যাক, অ্যান্ড মেকস হিম ব্ল্যাক-আর। নকল করার ক্রিয়া ইজ আনডান বাই ইটসেল্ফ, সাহেবতো সাহেবকে নকল করেনা, করতে পারেইনা, সে তো নিজেই সাহেব। এটা ছিল কোলোনিয়াল। আর পোস্টকোলোনিয়াল?

অ্যালবামটা আমার আর খুব ভালো মনে নেই। যদ্দুর মনে পড়ছে, উপরে লালচে কালোয় গাঢ় কালো দিয়ে ছাপা একটা লম্বাটে দাড়িওলা মুখ, অবশ্যই জালি, যেমন ক্যাসেট তখন মিলত পুরোনো নিউমার্কেটের ছোটো ছোটো দোকানগুলোয়। বোধহয়, বোধহয় না শিওর, গায়ক জর্জ মাইকেল। অ্যালবামটায় একটা গান ছিল মাংকি। এই গানটার নামটাও আমার মনে নেই। গানটায় নানা আমেরিকান কষ্টের কথা — এভরিবডি স্টার্টেড লিভিং হ্যান্ড টু মাউথ — ইত্যাদি, যখন প্রত্যেককেই ইঁদুরদৌড়ে দৌড়তে হচ্ছে — জাম্প অন দি ওয়াগন অর দে লিভ ইউ বিহাইন্ড। একটা ছোট্টো মেয়ের কথা ছিল যার ভবিষ্যত — জাস্ট অ্যানাদার হুকার। যদি স্মৃতি ঠিক থাকে তো গানটা শেষ হয়েছিল — দিজ আর দি গডজ অফ

অ্যামেরিকা, এদেরই সামনে আমরা নতজানু হই, দিজ আর দি গডজ অফ অ্যামেরিকা। এই অভিমান আশাভঙ্গ এবং শ্লেষকে খুব ভালো বোঝা যায় উডি গুথ্রির, বোধহয় চল্লিশের, যখন গুথ্রি আর সিগার একসঙ্গে গাইতেন, দিস ল্যান্ড ইজ ইয়োর ল্যান্ডকে মেলালে, ওই গা-ছমছম করা দেশপ্রেম। ... স বিলো মি, দ্যাট গোল্ডেন ভ্যালি, দিস ল্যান্ড ইজ ফর ইউ অ্যান্ড মি ... দিস ল্যান্ড ইজ ইয়োর ল্যান্ড, দিস ল্যান্ড ইজ মাই ল্যান্ড, ফ্রম ক্যালিফোর্নিয়া টু দি নিউ ইয়র্ক আইল্যান্ড। আমাদের কারো কারো কানে কি আরো কটকট করে বাজে, এই কারণে যে আমাদের কাছে আমেরিকা মানেই ভিয়েতনাম আর নাপাম, বব ডিলানের হার্ড রেইনস। তাই ট্রেসি চ্যাপম্যানের সাবসিটিতে গিভ মিস্টার প্রেসিডেন্ট মাই অনেস্ট রিগার্ডস ফর ডিসরিগার্ডিং মি আমাদের অনেক বেশি আত্মীয় লাগে? কিংবা, সুইসাইড — দি লাইন দ্যাট সেপারেটস দি হোয়াইটস ফ্রম দি ব্ল্যাকস।

তাই মেকলের মানুষরা এখন, ইহা পোস্টকোলোনিয়াল হয়, আমেরিকার দিকে তাকায়। তারা এবার ভক্তিভরেই তাকায়, দিজ আর দি গডস অফ অ্যামেরিকা। স্বাধীনতার পতাকা পতপত করে ওড়ে — অ্যামেরিকার উদ্ধত লিঙ্গ — স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। কী সিডাক্টিভ, যেমন যোনি দিয়ে জল কাটা গলায় চারুলতার কোলোনিয়াল অমল বলছিল, মেডিটেরানিয়ান, মেডিটেরানিয়ান, মেডিটেরানিয়ান। অবভিয়াসলি অমলের কোনো যোনি নেই। ছেলেদের তো থাকেই না।

বিজ্ঞাপনের লিফলেটের ভাষা দেখে বিস্মিত ওয়াটসনকে জানিয়েছিলেন হোমস, দিস ইজ ব্যাড ইংলিশ বাট গুড অ্যামেরিকান। এবং এটা লিখছিলেন কোনান ডয়েল, টমাস হার্ডির মত বীভৎস কলোনিপ্রভু যিনি কোনোদিনই ছিলেননা। এই অবীভৎস কলোনিপ্রভুরা, যারা নিজেরা তো লর্ড ক্লাইভ ননই, বরং লর্ড ক্লাইভদের শাসিত করে দেন, কেউ যথেষ্ট বিদ্যাসাগর হতে পারলে যারা তার টেবিলে ঠ্যাং-নাচানো অব্দি মেনে নেন, তাদের চোখের সামনে রাজপথ বদল হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের প্রথম ঔপন্যাসিক ছিলেন বাংলার স্কট, আমাদের মহত্তম কবি ছিলেন বাংলার এলিয়ট, আর আমাদের এতদিনকার ভাষা ছিল বাংলার ইংরিজি অর্থাৎ বাজে ইংরিজি। ক্রমশঃ গুড বেটার বেটারতর ইংরিজিতে আমেরিকানে আমরা আজকাল অতিনির্ণয়ের ব্যাকরণ শিখছি, আমি নির্ণয় করছি আমেরিকাকে, আমেরিকা আমাকে, আমরা সবাই সমান, এসো এই সমতার সভায়, হরি আছেন চারিভিতে, আছেন হরি রাজ্যপাটে, আছেন হরি গরুর বাঁটে, দেখো সবই হরি, আমরা সবাই সমান।

'দাদার ছেলে তো বিরাট ইঞ্জিনিয়ার', বলেছিল বাণীদা। তারপর একটু থেমে যোগ করে, 'আমেরিকায়'। সততই আর কোনো তথ্যের প্রয়োজন পড়েনা। 'দাদাও ইঞ্জিনিয়ার ছিল, এখানে'। 'এখানে' শব্দটাকে পড়তে হবে প্রয়োজনীয় মডুলেশন সহ। পুরো দাদার গল্পটা, তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল সল্টলেক, তখন তো সল্টলেকেই থাকতাম, অথবা বাণীদার দাদা তার বাড়িটা বানাচ্ছিল সল্টলেকেই — মনে নেই এখন আর।

ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি হালকা পর্দা, উড়ছে, তার উপর নড়ে লাল হলুদ আলো, নেপথ্যে আগুন জ্বলার শব্দ, প্রবল হয়ে ওঠে শব্দ, ক্যামেরা শ্লথগতিতে এগোয়, অসম্ভব শ্লথ, হাওয়ায় দুলতে থাকা আরো একটা পর্দাকে অতিক্রম করে যায়, কাঁচের পাল্লার দরজা, তার গায়ে অস্পষ্ট ছায়া আগুনের। আগুনের শব্দ কমে যায়, হালকা ভেসে আসতে থাকে বাচ্চার কথার শব্দ। ক্যামেরার দৃষ্টিভূমিতে আসে মেঝেতে শায়িত শরীর, সামনে উড়ছে আরো আরো পর্দা, দুটি শরীর পূর্নবয়স্ক, একটি বাচ্চার। মৃতদেহ। স্পষ্ট হতে থাকে। বাচ্চা মেয়েটির শরীরের উপর রাখা একটি বাঁহাত, ছিন্ন। ক্যামেরা এগোতেই থাকে। আরো উড়ন্ত পর্দাকে

অতিক্রম করে ক্যামেরা এগিয়ে যায়, মৃদু ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, চেয়ার দোলার, যোগ হয় বাচ্চার কথার সঙ্গে। দৃষ্টিক্ষেত্রে আসে একটি রকিং চেয়ারের কিছুটা, দুলছে, বসে আছে একটি বৃদ্ধ, চোখ বোঁজা। ক্যামেরা পেরিয়ে যায়। দরজার বাইরে থেকে শরীর ঢুকিয়ে এনে কথা বলছে ওই বাচ্চা মেয়েটি, যাকে আমরা এইমাত্র দেখলাম, তার বাঁদিক দরজার আড়ালে। হাসছে। যাকে কথা বলছে তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিনা, নেপথ্যে বৃদ্ধার অসুস্থ কণ্ঠ, আয়না এদিকে, একবার আয়। ক্যামেরা শ্লথ ঘুরে বৃদ্ধাকে ধরে। আবার ফেরত আসে। মেয়েটি নেই। দরজাটা নিরঙ্কুশ বন্ধ।

এখানেই শেষ প্রথম শট।

৩।।

পুরো চিত্রনাট্যটাই একটা শিশু প্রেতিনীর রূপকথা। মায়ার কুহকে নড়ে বেড়ায়, হাতছানি দিয়ে ডাকে, হাসির শব্দে উচ্চকিত করে তোলে চারদিক, কেউ কি কখনো দেখতে পায় তাকে?

বাণীদার দাদার, হ্যাঁ বাণীদার দাদারই, স্বপ্ন ছিল একটা বাড়ির। একটা স্বপ্নের বাড়ি। সবার স্বপ্ন পূর্ণ হয়না, বাণীদার দাদার হয়েছিল। ছেলেও আর্কিটেক্ট, এবং নিজেও, যদিও পুরোনো আর ভারতীয়, কিন্তু কাজ শেখার শুরু সেই ব্রিটিশ আমলে, কম বড় নির্মাণবিদ উনি নিজেও ছিলেন না। একটা ছবি বিশ্বাস ব্যক্তিত্ব, গম্ভীর, স্থিতধী — আর যে কোনো সভ্যতারই চূড়ান্ত চিহ্ন তো তার আর্কিটেকচারই, ওনাকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়। দৃষ্টি নতজানু হয়ে আসে। মানে আসত। একসময়।

এখন উনি বসে থাকেন।

এখানটায় একটু জলসাঘর, যদিও, লক্ষ্য করে থাকবেন, লম্বা হাতল আশু মুখার্জি কমল মিত্র আরামকেদারার জায়গায় রকিং চেয়ারটা আমার ওরিজিনালিটি।

এখন ওনাকে দেখে কল্পনাও করা যায়না একসময় উনি কী ছিলেন — এখন উনি ওনার পুরোনো সেল্ফের অ্যাবসেন্সটুকুও নন আর। বাড়ির প্ল্যান বানিয়েছিলেন ছেলে আর উনি দুজনে মিলে। টেলিফোনে, পোস্টে, ছেলের দুর্লভ ছুটির দুর্লভতর একত্র মুহূর্তগুলোকে খরচ করে করে। জমি, বাড়ি, বাড়ির চারপাশে, সামনে এবং পিছনে কতটা করে জমি ফাঁকা থাকবে — এই সমস্ত কিছুই করতে পেরেছিলেন নিজের আশ মিটিয়ে। লেক তো হয়নি, কিন্তু ঈশ্বর ওনাকে দিয়েছিলেন ঠিক ওনার বাড়ির লাগোয়া সুইমিং পুলের জলরাশি। সল্টলেকের তখন পত্তন হচ্ছে।

এমনটা হতে পারে যে ওরকম কোনো একটা বাড়ি দেখে, তার জনমানবহীনতা দেখে, বা হয়তো ওইরকম কোনো বৃদ্ধকে বাড়ি থেকে বেরোতে বা ঢুকতে দেখে, এইরকম কোনো একটা ছবি আমার মাথায় আগেই তৈরি ছিল, রুবিদার দাদার গল্প সেখানে স্লট পূরন করেছে। কিন্তু, হায়, গোটা সুইমিং পুল এলাকাটাই এত বদলে গেছে এখন। অবশ্য তাতে কীই বা এসে যায়, ইতিহাস তো নির্মিত হচ্ছে আসরানির হাতে। রামমন্দির আর বিদ্যাভারতীর ইতিহাসচর্চায় এখন আমার সত্যিই বিশ্বাস ইতিহাস নির্মিত হয় আসরানি বা আদবানির মত কোনো ভাঁড়ের হাতে।

বাড়ি তৈরি হচ্ছে, আকার পাচ্ছে স্বপ্ন, বাণীদার দাদার বাড়ির আর তার ছেলের বাড়িফেরার। মৃত্যুর মূহুর্তে গ্রিনকার্ডের মেয়াদ তো ফুরিয়ে যায়ই, তার আগেই, সমস্ত যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিনের শেষে, নিজের জাতিসত্তা খোঁজা শুরু হয়, রুটস। মিজেদ্দে মিজেদ্দে মিজেদ্দে, দেলাইট কম অ্যান মি ওয়ান গো হোম। মুক্তিমূর্তির স্তনাগ্রচূড়ায় আদি ও অনাদি মধুসন্ধানের পর দাদার ছেলে তখন ঘরে ফেরার স্বপ্নে আকুল। কিন্তু, হায়, মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো?

আমেরিকাকে আদিউ জানানোর বাসনায়, বাণীদার দাদার ছেলে, ছেলের বৌ এবং তাদের একমাত্র মেয়ে লং ড্রাইভে গেল। পথে অ্যাক্সিডেন্ট। ছেলে এবং ছেলের বৌ পথেই মারা গেল, পুলিশ আসার আগেই, এমনকী আমেরিকাতেও — দি পুলিস, দে অলওয়েজ কাম লেট, ইফ দে কাম অ্যাট অল। তাদের মেয়ে, বাণীদার দাদার একমাত্র নাতনিকে হেলিকপ্টারে তুলল রেসকিউরত পুলিশ। সে মারা গেল হেলিকপ্টারে।

এবং সে হেলিকপ্টারে মারা গেল বলেই, আমি জানিনা, বাণীদা আমায় যা বলেছিল, যদি গুলও হয় তো সেটা আমার না, বাণীদার, তার মৃত্যুর ক্ষতিপূরন পাওয়া গেল অনেক বেশি গুণ। ওরকমই নাকি যায়, আমেরিকায়। এবং অচিরেই, আফটার অল এটা আমেরিকা, সেই সমস্ত টাকা, একটুও তদ্বির ব্যতিরেকে, এতে মুগ্ধ বাণীদা, এসে গেল ভারতে। দাদার ছেলের এতদিনকার সমস্ত সঞ্চয় পাড়ি জমিয়েছিল আগেই, ভারতের দিকে, থ্রু প্রপার চ্যানেল। অনেক টাকা তো তারও আগে, বাড়ি বানাতে বানাতে।

বলার সময়ে, হয়তো ওই একই বেঞ্চি তে গণেশ পাইনের ইয়েও ডলা খায় বলেই, বাণীদার মধ্যে খুব ভিশুয়াল থাকছিল। 'জানো, ওদের কাজ তো, এত নিখুঁত, ওদের অ্যাপার্টমেন্টের সব জিনিষগুলো অব্দি, হুবহু একই ভাবে, প্যাক করে — সাবানকেসে সাবানটা ঠিক যেরকম ছিল, মেয়েটার একটা বিশাল টেডি, সবকিছু, প্রতিটা জিনিষ'।

এই টেডিটার প্রসঙ্গমাত্রই, আমার ভিতর, চিত্রনাট্যটা হাঁটতে শুরু করলো। বোধহয় তার কারণ কিউ এস কিউ টি, কায়ামত সে কায়ামত তক। ওই সিনেমার একাধিক দৃশ্যে ঘুমন্ত সেক্সবস্তু হিশেবে একাধিক বার একটি মানুষ সাইজের টেডির ওই ব্যবহার। তারপর যা সিমুলেটেড হয়েছে পরপর ফিল্মে। ঋত্বিক জরদ্গবের কারবুরেটরে জল ঢালার সঙ্গে লাগিয়েছিল মানুষের জল খাওয়ার গবগব, আর আমাদের রূপকথায় তো ছিলই, কথা বলা বটগাছ, যা থেকে ঝেড়ে তপু, তপন বিশ্বাস, গাছের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে নিঃসঙ্গতার মূহুর্তে ভাবত, গাছটা কি তাকে মনে রাখছে? বাকলের ক্ষতে হাত দিত, আরোগ্য করতে চাইত। বাক্য গুলো লেখার সময়ে কি মনে পড়েছিল ফেরা সিনেমায়, হিমাংশুর, হিমাংশুই তো বোধহয় নাম ছিল লোকটার, গাছের গায়ে খোবলানো ছাল দেখে রেগে যাওয়া? এর আগের মূহুর্তেই সে পেরিয়ে এসেছে কুস্তির অভ্যন্তরে কুস্তিগিরদের হোস্টিলিটি, এবং হয়ত, গে যৌনতা। গে নাও হতে পারে। বুড়ি, আমার এক বোন, বলেছিল, সুমো কুস্তিগিরদের কুস্তি করতে দেখে ওর টুমেসেন্স হয়। বুড়িকেও দেখেছি, টেডির বিষয়ে সম্পূর্ণ যৌন প্রতিক্রিয়ায় পৌঁছতে। বাণীদার দাদার চিত্রনাট্যে টেডিটা আরো একটু ইনকারনেটেড, কনজিওরড, প্রাণারোপিত।

বেঁচে থাকা দাদু আর ঠাকুমার সামনে তার নাতনি, যে তার শৈশবের মাতৃশরীরের নিরাপত্তা ছেড়ে কোনো-দিনই আর টেডিবিলাসের যুবক যৌনতায় পৌঁছবেনা, হাঁটে না, ডাকে সাড়া দেয়না, অ্যাক্সিডেন্টে হাত কাটা যাওয়া তার বাঁদিকটা আর দেখা যায়না, শুধু তার কথার শব্দ ভেসে বেড়ায় বাতাসে। শেষ জন্মদিনে, মৃত্যুদিনের ঠিক আগে, তার কথার ক্যাসেট পাঠানো হয়েছিল দাদুঠাকুমাকে, কথা, কথার শব্দ, শব্দ। আর তার টেডিটা নড়ে, হাঁটে, কথা বলে। ওর ঠাকুমা দেখতে পায়, রকিং চেয়ারে বসে দুলতে থাকা ওর দাদু, চোখ বন্ধ থাকায়, দেখতে পায়নি কোনোদিন।

এখন সেই বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা, একটি প্রাসাদোপম গৃহ, থার্ড ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডে তো বটেই, যার আর্কিটেকচারে মিশেছিল প্রথম বিশ্বের এফিসিয়েন্সি, এবং বাড়িভর্তি আমেরিকাফেরত কোমোডিটিপুঞ্জ — তার মধ্যে তো থাকতেই পারে একটা বড় পিয়ানো, ওদের নাতনি যা শিখছিল, আমেরিকাতে।

এখন একজন রোজ আসে, রাখা হয়েছে তাকে। আসে, পিয়ানো বাজায়, 'ওগো, শুনছো, দেখো, আমি তো আর নিজে উঠে কিছু দেখতে পারিনা, পিয়ানোটা ও ঠিক করে রাখতে পারছে তো, দেখো, খারাপ করে না ফেলে, আমার ছোটমেমের জিনিষ, ওগো, দেখো একটু'। এখানেই না থেমে গিয়ে, সেই রোগগ্রস্থ অশক্ত বৃদ্ধ গলায় আরো কি যোগ হতে পারেনা, 'ছোটমেম কিন্তু আমায় খেয়ে ফেলবে, রোজ একবার করে মনে করিয়ে দেয়'।

এতোটা বাক্য, কথা, বলে নিশ্চই মনে করাবে না। আরে, ফিল্ম কি নাটক নাকি, যে ডায়ালগ ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেই কনভে করার। কিন্তু একবার এলিমেন্টটা ইনট্রো হয়ে গেলেই হল, তারপর আর পায় কে? বার্গম্যান তার ফ্যানি অ্যান্ড আলেকজান্ডার থোড়াই বানিয়েছিল যদি তার থেকে কনসেপ্ট কে কনসেপ্ট, শট কে শট, সিকোয়েন্স কে সিকোয়েন্স নাই লিফ্ট করতে পারলাম।

এই করে নিজের পুরো গদ্যটাই বানিয়ে ফেললাম, এমন একটা প্যারাগ্রাফও কি লিখেছি নাকি কোনোদিন যাতে অন্তত একটা বাক্য নেই আগাগোড়া জীবনানন্দ থেকে ঝাড়া, কবিতা চাই কবিতা, গদ্য চাই গদ্য। বেশ কিছু বাক্যগঠন, বাক্যের মাঝখানে সম্পূর্ন প্রক্ষিপ্ত একপিস ক্লজ গুঁজে দিয়ে বাক্যকে মারাত্মক ইমোশনাল করে দেওয়া, কিছু ব্যক্তিগত বিশেষণের নাটকীয়তা, এসব তুলেছি সন্দীপনদার থেকে। রাঘবদা থেকেও নামিয়েছি কিছু ক্রিয়াব্যবহার, যদ্দুর মনে পড়ছে তিনবুড়ি। আর এখন তো তুমুল কেলো, ছোটোদের থেকে গ্যাঁড়াচ্ছি। সোমনাথ থেকে শব্দ নিয়েছি, আগের একাধিক লেখায়। এই লেখাটার পুরো গতিটাই তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করার চেষ্টা করছি দেবতোষের লেখার। অতয়েব, না পারার কোনো কারণ নেই।

সোলারিস এর গা-ছমছম, এমনকী বাচ্চা ও যাদু, বৃদ্ধাটিকে ধরতে হলেই ওজুর হাঁটু উচ্চতার ক্যামেরা, সত্যিই তো, তাকে একমাত্র দেখে তো তার নাতনিই, বা নাতনির টেডি, যাদের চোখ আর কোনোদিনই, এ জীবনে বা এ মরণে, প্রমাণ হাইটে পৌঁছবে না। তার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ টিকে ধরতে গেলেই, বাড়ির নানা বাস্তব অবাস্তব কোণ থেকে মেমরিজ অফ আন্ডারডিভেলপমেন্টের মত ক্র্যাম্পড ক্যামেরা। এইসব করে, কী এমন অসুবিধে, নানাধরনের গ্যাঁড়ানোর হাইব্রিডিটিতে, একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড চিত্রনাট্য দাঁড় করানোর? একটা রিসাইক্লড, রিমিক্সড, রিমেড সিনারিও?

আমার চারপাশের সবার অন্ধকার কুড়িয়ে চলেছি। আমি জঞ্জাল জড়ো করছি, পথ থেকে আস্তাকুঁড় থেকে। রিসাইক্লিং। বস্তির মানুষের পেশা। আধুনিক পুঁজি সভ্যতার জঞ্জাল কুড়িয়ে বেঁচে থাকে। কলকাতার, আমেরিকার। পুঁজিসঞ্চয়ের অ্যাকুমুলেশনের ব্যাকরণ অনুযায়ী এদের, এইসব অপুঁজিসুলভ ইনফর্মাল পেশার শীর্ণ আরো শীর্ণ হয়ে গিয়ে শুকিয়ে ঝরে খসে যাওয়ার কথা ছিল। কই যায়নি তো। বরং আসতে শুরু করেছে আরো আরো অতিনির্ণয়ে। ফর্মাল সেক্টরের টায়ার কেটে চটি, দড়ি, রিসাইক্লিং। পামার বাজার বস্তিতে। বস্তিতে বস্তিতে। পথের ধারে ধারে ইনফর্মাল খাবারের দোকান। তাদের ঘরের মেয়েরা কাজ করতে চলল ফর্মালি কেজো মানুষদের বাড়িতে বাড়িতে। বেশ তো বাঁচছে তারা, চীৎকার করে বাঁচছে। আমরা যাইনি মরে আজো।

৪।।

অন্ধকার জড়ো হতে থাকে। বাণীদার দাদার অন্ধকারকে ঘিরে শানুর অন্ধকার, রানুর ছেলের অন্ধকার। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে অন্ধকার। খুঁড়ে তোলা মাটির স্তূপ। কত কিছু বানানো যায় তা থেকে। মুখ মানুষ পিরামিড পুতুল

বাড়ি গাড়ি — নির্মাণবিদ্যা। রানুর ছেলে যেমন মাটি খোঁড়ে, ঢিপি বানায়, ভাঙে, আবার খোঁড়ে। ও কি মুখ বানায়? কার সে মুখ, কার?

> প্রাইমারি ইস্কুলে পড়ার সময়, রেণুদি, বড়দিদিমণি, কতবার কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, বাচ্চার কাঁচা হাতে আঁকা কোটি কোটি মুখে, এর মানে এই নয় যে আজকাল আমার হাত পাকা হয়েছে, খাতার পাতা, পাতার মার্জিন, এমনকি খাতার মলাট অব্দি ভরিয়ে রেখেছি। মুখ আর বন্দুক। বন্দুক যা আমাদের নিচের তলার সান্তুর ছিল — আস্ত একটা লম্বা নল, গোল রোমহর্ষক ধাতুর পাতে ঘেরা একটা তীব্র ট্রিগার, কাঁধে ঠেকিয়ে রাখার একটা ব্যক্তিত্ববান গম্ভীর সবুজ বিশাল বাঁট, নলের মাথায় আবার একটা খোঁচ মত লাগানো, যা দেখলেই মনে পড়ে যেতে বাধ্য ইয়াহিয়া ভুট্টো আর মাগো ভাবনা কেন্ন আমার তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেল্লে তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি — কিন্তু আমার ছিলনা। সেই অনুপস্থিত বন্দুক তার উপস্থিতি ফুটিয়ে তুলত আমার পেনের আঁচড়ে। নাকি পেন বা ক্যামেরার মত বন্দুকের লিঙ্গচিহ্ন? কৃষ্ণ যেমন তার বাঁশিকে নিয়ে ঘুরতেন — কেন, ইনকনফিডেন্স? তাই, বন্দুক তো নয় বোঝা গেল, মুখ কেন? সমস্ত বাচ্চাই কি খুব মুখ আঁকে? কোন মুখ খোঁজে, কার?

রানুর ছেলে কি ওর মায়ের মুখ খোঁজে, রানুর? রানুকে কি ওর মনে পড়ে? মনে পড়া কি সম্ভব এক বছর আট মাসের স্মৃতি? ও নিশ্চই ভুলে গেছে ওর মাকে। কিন্তু ভুলে যেতে পেরেছে কি যে ওর মা নেই, না, তার চেয়েও অদ্ভুত, ওর মা আছে না নেই তা ও জানেনা, কেউই জানেনা, বোধহয় জানবেও না আর কোনোদিন। হয়তো ও জানেই না ঠিক মা কাকে বলে। আজ, সাড়ে ছয় বছর বয়সে দিদিমাই ওর সারোগেট মা, ওর নিশ্চই ওর মায়ের অনুপস্থিতিটাই মনে নেই, তাই উপস্থিতিটাও।

কিন্তু শানু? শানুর পুরো অস্তিত্বটা, সেই ছোটবেলা, না, তারও আগে, নামকরণ থেকেই, ওর দিদি রানুকে দিয়ে চিহ্নিত। ওর ডাকনাম শানু, কারণ ওর দিদি, তার আগে থেকেই, রানু। আর শানুর ভালো নাম? লাবনী? দিদির নাম শ্রাবণীর সঙ্গে মিলিয়ে। নিজের নামটা, এমনিতেই, শানুর ভালো লাগে না। যেন একটা বাসস্টপ। উল্টোডাঙা মোড়ে অটোগুলো চেঁচায়, লাবনী-কালোবাড়ি-তেরোনম্বর। একদিন মনে হয়েছিল, একটা রাস্তার তেরো নম্বর বাড়িটা যদি কালো রঙের হয় আর সেই বাড়িতে যদি ওর বিয়ে হয় তো বেশ হয়। অটোওলাদের এই চীৎকারগুলো যেন একটা ভবিষ্যদ্বাণী। ভবিষ্যৎ জানতে কী ভালো লাগেনা? জ্যোতিষীদের হাত দেখাতে — বেশ বলে দেবে, বিয়েটা কবে।

দিদির বিয়ের পরপর সময়টায় এটা আরো বেড়ে গেছিল ওর, আরো দিদির ওই ক্লাস বিয়ে, সিনেমার মত, বিয়ে করে আমেরিকায় চলে গেল, বিলেত, এর পর হাঁটবে ঘুরবে দিলওয়ালে আর পরদেশের রাস্তায়, বাজার করবে লমহের সুপারমার্কেটে, ওটা অবশ্য লন্ডন ছিল, তা ওই একই হল, সিনেমায় একই লাগে, ছবির মত। আরো দিদির সঙ্গে তো ছোটবেলা থেকেই সবাই তুলনা করে আসছে তাকে। সেই সময় একটা জেদই চেপে গিয়েছিল, দিদির চেয়েও ভালো বিয়ে তাকে করতে হবে।

দিদি পড়াশুনোয় ভাল ছিল, তাকেও ভালো হতে হবে? সবার তো পড়াশুনো হয়না। পড়তে বসলেই তার ঘুম পেয়ে যেত। কী করবে? তারপর চেহারা? তাকে দেখে, একটু অবাক চোখে, চোখ গেলে দিতে হয়, ড্যাবাড্যাবা চোখ, সুলতামাসি বলেছিল, 'ও — তোমার দিদি তো অনেক ফরসা—স্বাস্থটা একটু ভালো করো, দিদির মত করো'।

> আমার বিয়ের দুচারদিন আগে, আমার আশু বৌয়ের সঙ্গে আলাপিত হয়ে, তাকে মাপছিল শানু। আমার বৌ-এর চেহারা, আমার এক বন্ধু ব্যানার্জির কথা মোতাবেক, জলবায়ু এবং অর্থনীতিগত ভাবে এফিশিয়েন্ট। রং এমনি যে রাতের চেয়ে দিনের বেলায় বেশি ভালো দেখতে পাওয়া যায় — আমাদের এই ট্রপিকাল রোদ্দুরে, দিনের বেশির ভাগ সময়টাই

আলোয় চোখের সামনে খুবই স্পষ্ট প্রতীয়মান পরিচ্ছন্ন বৌ, কোনো ঘোলাটে অস্পষ্টতা নেই, এটাই জলবায়ুগত এফিশিয়েন্সি। আর অন্যটা খুবই সহজ, ওই ফ্রেমে, সাঁইতিরিশ কেজির, কত আর খাবে, কোনো অর্থনৈতিক ধবস নামানোর কোনোদিনই কোনো সম্ভাবনা নেই। তাকে দেখে, সততই, কোনো বাড়তি আত্ম-অবমাননার বেদনা শানুকে পেতে হয়নি। এবং, এক্ষেত্রে, শানু অন্তত ওর সুলতামাসির চেয়ে বেশি সৌজন্যপরায়ণ ছিল, কোনো রঙের উল্লেখের মাঝপথে থেমে গিয়ে অন্য কথা বলে উঠতে হয়নি তাকে। অল্প আরামের হাসি হাসি মুখে শানু বলেছিল, ‘ইস্, আমার চেয়েও রোগা’।

এখন আর তেমন বিয়ের কথা ভাবেওনা শানু। দিদির এই পুরো ব্যাপারটায় যে বিরাট খরচ হয়ে গেছে বাবার, তাতে শত চাইলেও যে তার আর ভালো বিয়ে দিতে পারবেনা এটা বুঝে গেছে শানু।

ঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধ

এই অব্দি লেখা হয়েছিল, সকাল পৌনে ছটা থেকে লিখছি, এখন সাতটা চল্লিশ, বৌ বারান্দা থেকে কাগজ কুড়িয়ে এনে টেবিলে দিল, আজ আঠেরই ডিসেম্বর, আটানববই, কাগজটা দেখামাত্রই গা গুলিয়ে উঠল, স্টেটসম্যানের প্রথম পাতায় ওই বিকট মুখ, তাকাতে পারছিনা, পড়ব কী, শেষে ছবিটুকু কেটে ফের কাগজটা এনে দিল, আধ লাইন পড়তে না পড়তে, ভয়, লাফ দিয়ে নিচতলায় গিয়ে টিভি অন করলাম, প্রথমেই এমটিভি, হুতুতু, নানা নাচছে, ঘাপলা হ্যায় সব ঘাপলা হ্যায়, আমার অসহ্য বোধ হল, রিমোট টিপতেই থাকলাম, কোথায় বিবিসি, ওঃ-না, ব্রিটেনও তো আছে এটায়, শুধু শানু কেন, আজ আরো অনেক জায়গায় ব্রিটেন আর আমেরিকা এক, শেষ অব্দি জি-নিউজ, পুড়ছে, পুড়ে যাচ্ছে, প্যালেস্টানিয়ানরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে দিজ আর দি গডজ অফ আমেরিকা, পত পত জ্বলছে পতাকা

অ া ে ম ি ব. ক া হ ৈ ব. া ক অ া ত্র ্ক ম ণ

ক ে ব. ে ছ

সেই প্রথমবার, সেদিন ছিল সন্ধ্যা, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ থেকে বেরিয়ে, সান্ধ্য আজকালে পড়তে পড়তে মিনিতে উঠেছিলাম, আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করেছে, সেদিন মনে হয়েছিল, আজ কার দিকে তাকাব, আজ তো একেশ্বর পৃথিবী, রাশিয়া আর নেই পাওয়ারের মানচিত্রে। সেই প্রতিক্রিয়া ঢুকিয়েও দিয়েছিলাম, তখন লিখতে থাকা উপন্যাসে, পরে বাদ দিই, সোমনাথ বলেছিল খুব স্লো হয়ে গেছে জায়গাটা। বিপন্ন, খুব বিপন্ন লেগেছিল। সেই প্রথমবার আমেরিকার ইরাক আক্রমণে। আজ আর একবার, খবর দেখতে দেখতেই কি মনে হল? এখন তো এই লেখাটা লিখছি, আমারই কার গল্প, আমেরিকার গল্প, এটার জ্বলন্ত, জ্যান্ত, তাজা মেটিরিয়াল, স্টেটসম্যানের পাতায় ওই মুখ, ঝলসে পুড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে ইরাকের বাচ্চারা, ভিয়েতনামে যেমন গেছিল, জাপানে যেমন গেছিল, আমেরিকার বোমায়, আগুন শব্দ ভয় থেকে নিরাপত্তার দিকে মায়ের দিকে দৌড়চ্ছিল একটা বাচ্চা মেয়ে, দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে তার সারা গায়ের চামড়াটা গুটিয়ে কুঁকড়ে খসে যাচ্ছিল গা থেকে

ঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধঞ্ধ

বিয়ে তো হবেই না, কিছুই হবেনা তার আর, বড্ড জ্বালা করে তার, শরীর আর শান্ত হতে চায়না — কী করে শানু, কীই বা করতে পারে? তুহিনকে, সেই কবে থেকে তুহিনকে মনে মনে আর তুহিনদা বলেনা শানু, মা-বাবাও বেশ মেনে নিয়েছিল, হয়তো পছন্দও করেছিল, দিদির বিয়ের পর এখন ওদের খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। আর তুহিন তো নিজেও কী রোগা, এমন একটা কিছু আহামরি ছেলে যে তাও না, তুহিন তো তাকে বিয়ে করতে চাইতেই পারত, কেন করলনা? এগুলো ভাবতে ভাবতে শানুর খুব রাগ হয়, খুব, সমস্ত রাগ শরীরে নিয়ে রেলিঙের ধারে টুলে নিজের প্রাত্যহিক আসনে বসে থাকে। সামনে রাস্তার জমা করা ভিত কেটে তোলা মাটি, খোয়া, বালি আর ইঁটের স্তূপের আনাচে কানাচে খেলা করে বেড়ায় দিদির ছেলেটা। মাঝে মাঝে একটু

হাঁকডাকও করে শানু — যদি ওর পায়ে কিছু ফোঁটে, কিম্বা আছাড় খেয়ে হাত পা ছড়ে যায় তো মা সেই তাকেই মেজাজ দেখাবে। সবারই মেজাজ দেখানোর জন্যে একা সে-ই তো আছে।

দিদির ছেলেটা খেলা করছে, এখনো জমিটার একটুখানি আছে, খোলা, সামনের দিকটায়, কদিন বাদে আর তাও থাকবেনা। ছোটোবেলা থেকে, সে দিদি তারা সব খেলা করত ওই জমিটাতেই, চিরকাল শুনে আসছে ওখানে একটা পার্ক হবে, এখন একটা বাড়ি উঠছে, বিশাল বাড়ি। দিদির ছেলের, ওদের বয়সীদের খেলার জন্যে আর কোনো জমি পড়ে থাকছেনা। যার বাড়ি তাকে কোনোদিন দেখেনি, চেনেওনা শানু। পাড়ার কেউই চেনেনা। আমেরিকায় থাকে, তার টাকায় বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, কন্ট্র্যাক্টর এসে দুবেলা দাঁড়িয়ে থাকে, লেবারদের বকাবকি করে। পাড়ার ক্লাবকে অনেক টাকা দিয়েছে, পুজোয়। আরো দেবে।

হঠাৎ মনে হচ্ছে, একটা ভুল হল, বাণীদার দাদার বাড়িটাকে তো এইখানে লাগিয়ে দেওয়াই যেত। আগে মনে পড়েনি। আসলে এই লেখার ভূমিতে, নির্মিত সিন্থেটিক ভূমিতে এসে মিলে গেল শানু, রানুর ছেলে, আর রুবিদার দাদা, তার অনুপস্থিত নাতনির নড়াচড়ায় সমাকীর্ণ ওই বাড়ি। শানুকে, রানুর ছেলেকে আমি রোজ দেখি, আমারই পাড়ায়। শানুর বদলে যাওয়াটাও দেখি, বা হয়তো আন্দাজ করে নিই। চারুর মা-র সঙ্গে ওর ব্যবহারের বিকটতার মূহুর্তে আমি দেখেছি শানুকে। মুখে চোখে অ্যাকসেন্টে সেই হিংস্র হয়ে উঠতে পারার আরাম, আঘাতের ক্রোধে আশ্রয় খুঁজে উঠতে থাকা ওর অসহায়তা আর ইনকনফিডেন্স। যে ইনকনফিডেন্স উল্টোডাঙা মোড়ে ওই মস্তানের, আমার বন্ধু, এখন খুন হয়ে গেছে, বাবুনের। বাবুনকে গুলি করেছিল স্বাধীন, ভরা বাজারের মধ্যে, রোববার সকাল নটায়, সেই স্বাধীনও এখন লোপাট, গমা স্বাধীনের পৌষ্টিকতন্ত্র ছুরির মাথায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার করে এনেছিল। আমায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছিল ছোটন, বিবৃতির মধ্যে ছিল উল্লাস। হয়ত স্বাধীনহত্যার ওই বাক্যটা লিখতে কিবোর্ডে চাবি টিপে চলার মূহুর্তেও কাজ করেছে সেই একই উল্লাস।

বাবুন আমার বন্ধু ছিল, আমার কত নিঃসঙ্গতার মূহুর্তে বাবুনের কত বীরত্বের গল্প আমায় রসেবশে রেখেছে। কীভাবে, হাড়কাটা গলির মধ্যে দিয়ে চলমান মিছিলের উপর পাশের একটা বাড়ির ছাদ থেকে পড়তে উদ্যত বোম দেখে ও সেই বোমধরা হাতেই ওয়ানশাটারের গুলি চালিয়ে দিয়েছিল, সেই পলক ঝপকতে পার হয়ে যাওয়া উত্তেজনাটার স্লোমোশান বর্ণনা। বা, শিয়ালদায়, চা খেতে খেতে বোম-মারামারি দেখতে দেখতে বোম বানানোর উপকরণ এবং দক্ষতা বিষয়ে তুলনামূলক অ্যানালিটিকাল আলোচনা। আমি দেখতাম, গল্প করতে করতে, কীভাবে নিজের ভিতর নিজেকে আবাহন করার, জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে বাবুন। নিজেকে খুঁজে পেতে চাইছে। বড্ড বেশি ভয়ে বাঁচতে হত ওকে, কোনোদিন কারো কাছে ভয় খেয়ে যাওয়ার ভয়ে। এই ভয়ের আবহ ছেড়ে শেষ অব্দি ব্যবসা বাণিজ্য করতে চাইছিল, যেমন সব বুড়ো মস্তানেরাই করে। সেইসময়েই খসে গেল। যে সামান্য দু চারবার যে সামান্য ভায়োলেন্সে পৌঁছে যেতে দেখেছি বাবুনকে, তার প্রত্যেকবারই লক্ষ্য করেছি, প্রতিটি হিংস্রতাই আসলে কি প্রচণ্ড প্রচারমূলক, ইনকনফিডেন্সটাকে ঢাকতে গিয়ে, জোর করে, নিজের কাছেই, আরো আরো জোরে চীৎকার করে প্রমাণ করা। নিজের ব্যক্তিত্বকেই খুঁজে পাওয়া, বাবামা-রা যেমন, বাবামা হওয়ার দৌলতে, প্রায়ই পায়, শাসন করার ক্রিয়ায়, নিজের ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়ার সুযোগ। সবাই তো আর জন্মসূত্রে ছবি বিশ্বাস হয়না, কর্মসূত্রে হতে হয়।

অমন পাতলা রাতজামা কিছুতেই শানুর স্বাভাবিক না, কিছুতেই নিজের শরীর বা তার প্রদর্শনকে ভুলে গিয়ে পরা বা পরে বাড়ির বাইরে আসা শানুর পক্ষে সম্ভব না, সম্ভব না বলেই তো মনে হয় — কে জানে? এই

সব অভ্যাস এত দ্রুত বদলাচ্ছে আজকাল। সিনেমা যা পারেনি, টিভি আর কেবল টিভি তা কত সহজেই পারল, অন্দর হি অন্দর অন্দরটা বদলে গেল, মেয়েরা, মেয়েদের পোষাক। শানুর শরীরে তো খুব বেশি কিছু নেই দেখার, শানু বোধহয় সেটা নিজেও জানে, সেই জন্যেই কি আজকাল আরো, বাবুনের মত, নিজেকে খুঁজে পেতে চাইছে? অথবা শানু কি আজকাল খুব এমটিভি দেখে? যেখানে, যদিও এমটিভি তার ইংরিজি প্রোগ্রাম কমিয়ে আর হিন্দী বাড়িয়েই চলেছে, বা স্টারটিভির সিনেমায়, অনেক মেয়েকেই শরীর প্রদর্শনের গ্ল্যামারে রোজই দেখে শানু যারা তার চেয়েও রোগা এবং তার চেয়েও কালো। তাই, রাতজামার সিঁড়ি বেয়ে সেইখানেই পৌঁছতে চাইল, সেই আমেরিকায়, যেখানে কোথাও মাটির নিচে, গহ্বরে, তার দিদি রানু শুয়ে আছে, হয়ত, নিশ্চিত জানেনা সে ওইখানে শুয়ে আছে কিনা।

> যদিও এই ভারতবর্ষে, উজলি কিরন, বনমে হিরন, মন্দিরমে হো এক জলতা দিয়া আর খুশবু লিয়ে আয়ে ঠান্ডি হাওয়া থেকে সলমনের বাহো কি দরমিয়ান পৌঁছতে আর মুশকিল ইজাহার প্রকাশ করতে করতে মনীষাকে কেজি দশেক বাড়াতে হয়েছিল। ভাস্কর বলেছিল, সিন্ডি ক্রফোর্ড আর নাওমি ক্যাম্পবেলরা এখানে একটা প্যান্টিও বেচতে পারবেনা, লোকে ভাববে ওই কোমরে প্যান্টি থাকবে কী করে, খুলে তো পড়ে যাবে। ভুল, ভাস্কর ইনোসেন্ট, জাতিসত্তার উপর বড্ড বেশি নির্ভর করেছিল, জাতিসত্তা সত্যিই একটা সচেতন লোকেশন অফ কালচার, লোকেশন যা রিঅ্যা-লোকেশন, মিথিক মেমরি বানিয়ে তুলতে থাকা, বালি সাগুর রিমিক্সে, ডালের মেহন্দীর গলায় ভারতের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি জন্মাচ্ছে, এই ভারতবর্ষ পয়দাই হয়েছে পরবাসে, যেখানে ডলারও আছে, মেহন্দীও, হাইব্রিড। এনআরআইদের ভারতবর্ষ। যাদের ডান্ডিয়া খেলতেই হয়, দুর্গাপুজো করতেই হয়, নইলে তার নিজেকেই বলতে হবে, আমি তবে কেউ নই। এই আইডেন্টিটি, গোড়া থেকেই, আইডেন্টিটি অফ ইনকনফিডেন্স, নিজেকে ভারতীয় বলে চিহ্নিত করতে হয় তো তারই, যারা ব্যামবিনো থেকে ক্যাসেট নিয়ে গিয়ে দূর দ্বীপে বসে শোনে, এই পরবাসে রবে কে?

নিজেকেই খুঁজে পেতে চাওয়া, শানুর, রাতজামায়, যা দিনের বেলায় পরে, বা হয়ত দিনজামাই, নিজেদের গেটের পাশে টুলে বসে থাকে, আর ওর দিদির ছেলে মাটি খুঁড়ে খেলা করে। নিজেকেই খুঁজে পেতে চাওয়া, হয়তো, চারুর মা-এর উপর ওর ক্রোধে, হিংস্রতায়, কাউকে না কাউকে তো শানুরও দরকার। সকালে বারান্দা থেকে দূরে ওকে দেখেই মনে হয়েছিল, টেন্স, কারুর জন্য অপেক্ষা করছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দূরের পথের দিকে।

চারুর মা-এর সঙ্গে শানুর যুদ্ধটা চলল ঘন্টা দুয়েক ধরে। পাশের বাড়ির কলতলায় বাসন মাজছে চারুর মা, মাঝে মাঝে উত্তেজিত দাঁড়িয়ে পড়ছে, শানু কখনো রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে, কখনো বেরিয়ে আসছে বাইরে, সেই মূহুর্তে জামার বিকিরণটাও ভুলে যাচ্ছে, রাস্তা দিয়ে হয়ত কত কত কে কে চলে গেল, শানু খেয়ালই করল না। পরের বা পরের পরের দিন, সকালে, আবার ওকে ওর অভ্যস্ত টুলে দেখে, সিগারেট আনতে যাচ্ছিলাম, বলতে চাইলাম, ওরকম করে নাকি কেউ? নিজেকেই তো ছোটো করা, রেগে থাকা মানে তো ভুলতে না পারা, বড্ড বেশি পাত্তা দেওয়া। শানুর বা হয়তো নিজেরও অজান্তে নিটশে লড়াচ্ছিলাম। শানু, ও কোনোদিনই সৌজন্যে বেশি অভ্যস্ত না, আবার একটু একটু চারিয়ে গেল সেই দিনের লড়াইয়ের হিংস্রতায়, 'আমাকে ওসব বলতে এসোনা তো'। আরও জানাল, এসব আসলে চারুর মা-এর না, চ্যাটার্জিদের পয়সার গরম, বেশি পয়সা পেয়েই কাজ ছেড়ে দিল, একবার জানাল না পর্যন্ত, চ্যাটার্জিদের বজ্জাতি, খুব পয়সার গরম হয়েছে, ছেলে, ওই বাবুদা, আমেরিকা থেকে টাকা পাঠাচ্ছে। দিদির সময় বাবা কতবার করে জানাল, কোনো খোঁজ পায় কিনা, পারবেনা সেটা একবার জানাল না পর্যন্ত, একটা ফোনও তো করতে পারত, অথচ একসময় ফোন করত তো এই আমাদের

বাড়িতেই, আমি ছুটে ছুটে গিয়ে বলে আসতাম, যে টাইমে ফোন আসার কথা সেইসময় নিজেদের ফোন অব্দি করতামনা।

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কোনো একটা পেপারে কিছুটা ইকনমিক্স থাকে, মাইক্রো, সেগুলো দুচারদিন আমার কাছে দেখেছিল বাবু, এখন অ্যারিজোনায় আছে, লিখতে হয় এজেড, ওরা তো আবার জেড বলেনা, বলে জি, আমাকে ওর ঠিকানাটাও দিয়েছিল। গল্প করেছিল রাস্তা কীরকম দুঃসহ নির্জন থাকে ওখানে অ্যারিজোনায়, ওর দম আটকে আসত আগে, এখন অভ্যেশ হয়ে গেছে। বলেছিল, যদি কখনো যেতে, তোমাকে খাওয়াতাম, একটা খাবার পাওয়া যায়, যেটা আসলে বিশুদ্ধ লঙ্কার পাকোড়া, আর, জানো, চিংড়িমাছ ওখানে খুব খাই, এখানে তো পেতামই না। আমেরিকার শহর মানুষ এদের জ্যান্ত রকমে ধরা যায় এমন কোনো সিনেমা দেখতে বসলেই মনে হয় এরকমই কোনো রাস্তা দিয়ে সমস্ত দিনের শেষে বাবু ঘরে ফেরে, ফাঁকা একা নিঃসঙ্গ। বাবুর উপর এত রাগ শানুর, বাবু কীই বা করতে পারত, শানুর বাবা পীযূষদা তো পাগলের মত সেসময় দৌড়ে বেরিয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনারদের বাড়িতে যেতেও বোধহয় ছাড়েনি, কিন্তু কিছুই করতে পারেনি, কিছু করার ছিলনা পীযূষদার। ইন্টারপোল যাকে খুঁজছে, বাবু তার কী খোঁজ পেত?

পীযুষদা এখন কী ভাবে? রানুকে আর ফিরে পাওয়া যাবে — একথা ভাবার মত উন্মাদ কেউই নয়। রানুর তাহলে কী হল? সেই ছেলেটা, নাম জানিনা, এখন একটা ক্যাসেটের আর ইলেকট্রনিক্সের দোকান দিয়েছে, যার সাথে রানুর একটা প্রেম হচ্ছিল, যেটা আটকাতে তড়িঘড়ি আরো বিয়ে দিল মেয়ের পীযূষদা, এমএ পড়া বন্ধ করে, তার নিশ্চই এতদিনে বিয়ে হয়ে গেছে, সে কি আর ভাবে রানুর কথা? রানু কি মরে গেছে, মানে খুন? কী ভাবে মেরেছিল রানুকে রানুর সেই বর, রানু ছাড়াও, পরে জানা গেছিল, যার বিয়ের সংখ্যা কমপক্ষে ছয়, যার পেশাই ভারতে আর বাংলাদেশে এসে বিয়ে করে তাদের নিয়ে যাওয়া, যৌতুকসহ, যার প্রপার্টি ছড়ানো আছে বাংলাদেশে, ভারতে, হংকং-এ এবং হয়তো আরো কোথাও। সেই লোকটা, তার কি কখনো মনে হয় তার সাড়ে ছয় বয়স্ক ওই ছেলের কথা, তখন কি তার একবারও প্রার্থনার সকল সময় শূন্য মনে হয়? সেই লোকটা কী ভাবে? কী প্রতিক্রিয়া হয় তার? যতদূর শুনেছি, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের পড়াশুনোয় ভাল দুই ছেলে, তার দাদা আর সে, দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বিলেত গেছিল। তারপর, কী সেই পদ্ধতি যার মধ্যে দিয়ে সে ওইরকম হয়ে উঠল, যাতে তার চিন্তাকে একটুও ভেবে উঠতে পারিনা, যত চেষ্টাই করিনা কেন, লোকটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে আমার, সেই এনআরআই আমেরিকাবাসী ভারতীয়টিকে। কী সেই মোক্ষ যা পেয়ে গেলে মানুষ তার নিজের ছেলেকে ভুলে বেশ বেঁচে থাকতে পারে?

৫।।

"আমেরিকা, আমেরিকা, সবকিছুতেই আমেরিকা, সবকিছুই আমেরিকা — মনে মনে এরকম একটু বিড়বিড় করার পরই মনে হয়, অ্যাঁ, আমেরিকাটা যেন কী? কথাটাই কেমন অদ্ভুত শোনায় কানে — কোনোদিন শুনেছি আগে? এই মুহূর্তে এসব ভাবার আর সময় কই? চারুর মা আসার অপেক্ষা, সেই কখন থেকে বসে আছে, আজ একটা এসপার কি ওসপার করে ছাড়বে — শরীরের জ্বালা যেন কমতে চায়না।"

উপরের এই অংশটা ছিল এই লেখাটার প্রথম লিখে-ফেলাটুকু, ফাইলটার নাম দিয়েছিলাম আমেরিকা-পিএমফাইভ, যেমন হয় যেকোনো পেজমেকার ফাইল। তখন জানতাম শুধু এটুকুই যে এটায় রানু-শানুর কথা থাকবে, বাণীদার দাদার কথা থাকবে, আর অনেক আমেরিকার কথা। কেন?

শানুর চারপাশে টুকরো টুকরো ডিজমেম্বার্ড আমেরিকা পড়ে থাকে। তার দিদিকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমেরিকা-প্রবাসী পাত্রে, বিয়ের বাজারে হাইয়েস্ট অ্যাচিভমেন্ট। যে বিয়ে থাকে শানুদের সুদূরতম স্বপ্নে। এখনো কি সেই স্বপ্ন দেখে শানু? তার দিদি হারিয়ে গেছে আমেরিকায়। তার বাড়ির পাশের পার্ক বিক্রি হয়ে যায়, কাজের লোক বিক্রি হয়ে যায় আমেরিকান টাকায়। সিনেমায় আমেরিকা, গানের চ্যানেলে আমেরিকা, কী সেই আমেরিকা? কোথায়?

গল্প কেন খুঁজছিল শানুকে রানুর ছেলেকে বাণীদার দাদাকে, আমেরিকাকে? জানিনা। এর মধ্যেই তো এই লেখায় দু দুটো গল্প লেখা হয়ে গেল, কেন এই গুলোকেই গল্প বলে মনে হল, কেন এই গল্পগুলোই মাথার ভিতর ভিড় করে ছিল, জানিনা। শুধু জানি যে আমার কষ্ট হয়, রানুর কথা ভাবলে, শানুর কথা ভাবলে, রানুর ছেলের কথা ভাবলে, সারা শরীরে অসহায়তা জাগে, হাত পা ছুঁড়তে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে কেন এমন হয়। কেন দাদার ছেলের কষ্টের কথা বলতে বলতেও বাণীদার দারিদ্র অমন ছুটে চলে আসে সামনে?

একসময়, আমার রাজনৈতিক অস্তিত্বের মাঝখানে, আমেরিকা শব্দটার একটা আলাদা অর্থ ছিল, এখন আর তা নেই। এখন তো একের পর এক রাজনৈতিক অর্থনীতির লেখা লিখে যাচ্ছি, যাদের চূড়ান্ত মোক্ষপ্রাপ্তি, যদি কোনোদিন ঘটে, আমেরিকার জার্নালে, আমেরিকায় ছাপা বইয়ে, প্রকাশিত হওয়া। সেটা কি মেনে নিতে আমার কোথাও একটা কষ্ট হয়? সেই কষ্টের ঋণাত্মক উৎসব এই লেখা? শানুর আমার রানুর ছেলের পোস্টকলোনিয়ালিটিকে বোঝার মধ্যে যেন আমি সেই কষ্টটাকে পেরিয়ে যেতে পারব?

কিন্তু শুধু তো এই টুকু নয়, লেখা তো উল্লাসও। বাবুন খসে যাওয়ার, স্বাধীন খুন হয়ে যাওয়ার ঘটনার বিবৃতির উল্লাস। আগেই লিখেছি, সেলিব্রেশন। সেলিব্রেশন যা একই সঙ্গে সেল। লেখক, তার লেখায়, লেখাকে, লেখার বিষয়কে, সেলিব্রেট করে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানের মত। আর এই ক্রিয়ায়, শূন্য থেকে ধরে আনে আস্ত একটা পেখম মেলা শকুন, কেউ ভাবতেই পারেনি ওই শকুনটা, ওই অজস্র শকুন, ওখানে আগে থেকেই ছিল, লোকালয়ের, মেট্রোপলিসের অত কাছে, অত ভিতরে, শকুনের অতবড় একটা কলোনি। লেখক তার অকস্মাৎ এবং আকস্মিক রোমান্সের মূহূর্তে, সে কি তখন ঠিক জানত, কার সাথে বা কীসের সাথে রোমান্স, আবিষ্কার করে ফেলেছিল।

এরকমই তো হয়, ভিকু নাচতে শেখেনি এ জীবনে কোনোদিন, বড্ড বেশি খুন করতে হয়েছে তাকে, নাচতে গেলে তার, বিসর্জনের নাচে দেখবেন, পা মুভ করেনা, হাত ঝাঁকিয়ে মুখ ভেটকে তাকে গাইতে হয়, সপ্নে মে মিলতি হ্যায়, কুড়ি মেরে সপ্নে মে মিলতি হ্যায়।

তারপর, শেষ অব্দি, মেরিন ড্রাইভের লহর সামনে রেখে উচ্চকিত মহারাজ ভিকু আর মহারাজ রইলনা, মরে গেল ভিকু পাসোয়ানের মত, হালহদিশহীন, আনমোর্নড, আনসাঙ, আনগার্ল্যান্ডেড। বাস্তবতার, পরাবাস্তবতার অজানা অন্ধকারে, নামগোত্রপরিচয়হীন। যেখান থেকে সত্য এসেছিল একদিন। কেউ কখনো জানতে পারেনি তার পূর্বপরিচয়, এমনকী বিদ্যাও না।

কালুমামার লাশ ঢিলে হাত আর মুন্ড সহ ঝুলে আছে গাড়ির জানলার বাইরে, এই গাড়ি তাকে এবং সত্যকে আর পৌঁছে দেবেনা মুক্তির বন্দরে, সত্য তখন সরীসৃপের মত, গুলিবিদ্ধ অশক্ত শরীর টেনে টেনে, বিদ্যার কাছে যাচ্ছে, সব যুদ্ধের শেষে, সমস্ত যুদ্ধের পাপ শরীরে বহন করে, যেন শাপগ্রস্থ অশ্বত্থামা। অশ্বত্থামার শৈশবকে মনে করুন, নিদ্রিত পাণ্ডব-অন্দরকে

ধবস্ত করার আগে অশ্বত্থামার ইতিহাসটা, ছোটবেলা থেকে সে দেখে আসছে তার প্রতিভাবান লড়াকু বাবাকে লাঞ্ছিত হতে, দ্রুপদের হাতে, অন্যদের। দুধ সে পায়নি কোনোদিন, তাকে ঠকিয়েছে তার পিটুলিগোলার শৈশব। আর কুরুক্ষেত্রে, তার পিতা আচার্য দ্রোণকে অর্ধসত্যে আচ্ছন্ন করল তার সবচেয়ে সত শিষ্য, প্রিয়তম শিষ্য অর্জুন তার ধনুকের ছিলা খুলে নিচ্ছে, অজ্ঞান অচেতন আচার্য দ্রোণ ভূপাতিত, খাঁড়া হাতে তার বলি চড়াল ধৃষ্টদ্যুম্ন।

গিরগিরাতে হুয়ে, গুলিবিদ্ধ, অশক্ত সরীসৃপ সত্য, শরীর টানতে টানতে, বিদ্যার দরজায় গিয়ে পৌঁছয়, দরওয়াজা খোলো, বিদ্যা, দরওয়াজা খোলো। শুধু একবার,, নামহীন অনির্দেশ্যতায় ফেরত চলে যাওয়ার আগে, বিদ্যাকে দেখতে চেয়েছিল সত্য। বিদ্যা দরজা খুললনা।

সত্য বিদ্যাকে পেয়ে ওঠেনি। বিদ্যাও পেয়ে ওঠেনি সত্যকে।

ফনকার হিশেবে মনোহর সফল হয়েছিল, অন্যদের ঠকাতে পেরেছিল। অর্থাৎ, নাটকের আনন্দ দিয়েছিল। নিজেকেও বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছিল, সফট ফোকাসে কোমল গর্ভবতী অপূর্ব সত্যিই আসে ওর জেলের সেলে, ডন দেওয়াকালীন পিঠে বসে পড়ে, মনোহরের বোঝ বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু এই বোঝ নিভাতেই তো ও চেয়েছিল। ওয়াজুদ, আইডেন্টিটি খোঁজার শেষ সিকোয়েন্সে, নাটক আর অডিয়েন্স, ফ্ল্যাশ ব্যাক আর ফরোয়ার্ড যখন জমাট দ্রবীভূত এক, গুলিবিদ্ধ মৃত পতিত মনোহর আর কোনোদিনই কোনো অডিয়েন্সের মনোহরণ করবে না, অপূর্ব তার গর্ভে ফিরিয়ে নিয়েছিল মনোহরকে, মাতৃহীন মনোহর যাকে খুঁজত, মাতৃত্বে সমাসীন করেই খুঁজত।

শুধু মা খোঁজা নয়, বাবা ছাড়াও বাঁচতে শিখেছিল না মনোহর, খুনের মূহুর্তেও আঙুল বাজাত, সব মূহুর্তেই, যেন বাবা তার সঙ্গেই আছে, টাইপ করে চলেছে, টক টক টক, টক টক টক।

এক অন্ধকার, দুই অন্ধকার, টেনে আনে আরো নানা অজস্র অন্ধকারকে, রহস্য বিকিরণ করে, চারিয়ে যায় নানা বাসনা, সন্ধান, কার সে মুখ কার?

সহজ তখন চার বছরের বাচ্চা, লিখতে লিখতে আমার হাতে কালি লেগে যাওয়ায়, ওর রুখু চুল গাল আর কপালের মধ্যে কুতকুতে চোখ পাকিয়ে বলেছিল, পিশা, ইয়োর হ্যান্ডজ আর ডার্টি। ওর তখন আধো উচ্চারণ, হ্যান্ডজ তো না অ্যান্ডজ, ডার্টি না, দাহ্‌টি।

হ্যাঁ, সহজ, মাই হ্যান্ডজ আর ডার্টি। অন্ধকার লিখতে লিখতে আমার হাতদুটো অন্ধকার হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছিনা। বুনুয়েল ওর আন্দালুশিয় কুকুরের গল্পে হাত বেয়ে পিঁপড়ে উঠিয়েছিলেন, সেটা তবু একটা ক্রিয়া, জৈবনিক, ইকোলজি, শব খেয়ে কীট। আমার সমস্ত লেখাই মেময়ারস অফ অ্যান ইনভিজিবল ম্যান, আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছিনা, সহজ, বড্ড বেদনা, আমি আমার হাত মুখ নাক কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। তাই আমি আমার লেখাও দেখতে পাচ্ছিনা। আমার বিদ্যা কোনো সত্যকেই পেয়ে উঠছেনা। এখনো আনগ্রাউন্ডেড, পরে হয়তো কখনো গ্রাউন্ডেডও হবে, সেমিনার বিদ্যাচর্চা পুস্তক, কিন্তু কেন? কে জানি বলেছিল, কেন লিখি এই প্রশ্নটার দিকে কখনো তাকাতে নেই।

কদিন আগেই পড়লাম অনির্বাণের একটা লেখা, গোড়াতেই অনেক ধানাইপানাই করেছে, নেশন আর জাতি নিয়ে, নেশন শব্দটার অনুবাদ করতে পারছেনা। এই অস্বস্তি ওর, আমার, আমাদের সকলের — নেশন শব্দটার অনুবাদ করা যায়না। এই এতগুলো বছর, কোলোনিয়ালিটি, পোস্টকলোনিয়া-লিটির পরও, নেশন, জাতি, একটা বিজাতীয় ধারণা। জাতির বাইরে। বাইরে থেকে চাপানো।

আমাদের দেশপ্রেমগীতি, যা শুনে সারারাত তার শয্যায় চঞ্চ ল ছিল বিমলা, সিডাক্টিভ সন্দীপ জানাল, মার্সাই গানের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

আদবানিরা মিহিররা তাই একটা জাতিসত্তা খোঁজে। একটা নেশনের আধার। মিহিরের প্রসঙ্গ ছিল একটি অসহায়তা এবং একটি মাতলামির গল্পে, যা ফাইনালি বেরিয়েছিল ত্রান-পরিত্রান নামে। মিহির, আরো নানা মিহিরেরা জানে মুসলমানরা ভীষণ কমিউনাল, তথ্য হিসাবে কত কিছু বলেও, খিদিরপুরে পাকিস্থানের ফ্ল্যাগ, এমনকী শুয়োর খাওয়া বা দুটো বিয়ে নাকচের প্রসঙ্গেও ন্যূনতম বুর্জোয়া কাস্টহীন ক্রিডহীন গনতন্ত্রে না পৌঁছতে পারা, এইসব। তার সমাধানে মিহিরেরা, তাই তাদের আশ্রয়ে আদবানিরা চলে যায় হিন্দু নেশনের সারোগেট ইউনিভার্সালে। নেশন নামক ইউনিভার্সাল নেই তো কী হল, আমরা, ভারতবর্ষ নামক কারাগারের বন্দীরা, অনেক খুঁজব, তাই মিলেও যাবে, একটা সারোগেট নেশন, অ্যান্টিমুসলিমিজম, পাকিয়ে তুলব আর একটা ইসলামিক নেশন, ইরান বা আফগানিস্তানের মত, শুধু যার নাম হবে হিন্দু ভারতবর্ষ।

প্রথম বার যখন আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করল, মিহির, চাইনিজ খেতে খেতে, আধোআলোকিত রেস্তোরাঁয়, আমায় বলেছিল, বেশ একটা উল্লাসও ছিল বলার ভিতর, নোস্ত্রাদামুসের যুদ্ধ বোধহয় শুরু হয়ে গেল, বুঝলে।

ওর লেখায় তো আছেই, এই শতাব্দীর একদম শেষে এসে একটা যুদ্ধ বাধবে, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

আমি পাদপূরন করেছিলাম, কী — মাদার অফ অল ওয়ারজ? তখন সাদ্দামের ওই ফ্রেজটা খুব চলছিল বাজারে।

মিহির জানিয়েছিল, হ্যাঁ। সমস্ত মুসলিম আর সমস্ত খ্রিশ্চিয়ানদের ভিতর, একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ, যাতে, শেষ অব্দি, হেসেছিল মিহির, এর চেয়ে মজার আর কী হতে পারে, পুরো ইসলাম ধর্মটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমার সারা গা শিরশির করছিল, নোস্ত্রাদামুস এসেছে ভায়া ওয়েস্টার্ন মিডিয়া, তার মানে ওয়েস্টে, বাতাসে এই কথাটা আছে, এর পরের যে কোনো যুদ্ধের সম্ভাবনাই, যে কোনো টেনশনই কি অতিনির্নীত হবেনা এই কথাটার উপস্থিতির দ্বারা? যে বাতাস এই বাণী বহন করছে তার ঝাপট কি একটুও বেশি কনভিন্সিং করে তুলবেনা আদবানির মত ভাঁড়েদের ওয়ার ক্রাইগুলো। মুণ্ড কামানো এস এস বাহিনীর ঘাতকদের আগে যোগ হবেনা একটা আর? খবরের কাগজের ছবিগুলো মাথায় ভাসে — আর এস এস বজরং দল হিন্দু পরিষদের মাথা কামানো সন্তানেরা শুযোরের উল্লাসে দাপাচ্ছে, ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে, চলো যোগ দিয়ে আসি, এখনো মাত্র একটা মসজিদ ভেঙেছি, চলো ভাই সব, আর যে যেখানে শুযোরের বাচ্চারা আছো, তৈরি হয়ে নাও, চলো ভাঙি, সঙ্গে দুচারটে মানুষও মারব, দেখছোনা উমা ভারতীর কী ফূর্তি, মনোহরের শ্যাম জোশির পিঠে উঠে পড়েছে।

ছবিগুলো মনে পড়ে আর শরীরে আতঙ্কের শিহরণ বয়ে যায়, এরকম ছবি তো অজানা না, কত দেখেছি, নাজিদের নিয়ে তোলা সিনেমায়। এই মনোহর শ্যাম জোশি আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, হয়ত আর কদিন বাদে এর তৈরি করা সিলেবাসেও ছেলেদের পড়াব। একদিকে বিদ্যাভারতী, আর অন্যদিকে, ছুটি না দিলে, জন্মাষ্টমীর দিন ইস্কুলে ফোন করে থ্রেট, এ-তো কলকাতাতেও শুরু হয়ে গেছে, অন্যসবও শুরু হল বলে। আজ আর কাল।

খ্রিশ্চিয়ানরা, আমেরিকানরা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করবে? করতে গিয়ে কতবার, কতগুলো বাচ্চার চামড়া ঝলসাতে ঝলসাতে আলাদা হয়ে যাবে তার শরীর থেকে? আরও কতগুলো?

ইহুদিরা, যাদেরও একইরকম নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল ইউরোপ, হাজার হাজার বছর ধরে ক্যারি করে চলল মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ার বেদনা, প্রতিটি উৎসবে ভোজসভায় অনুষ্ঠানে তারা এ অন্যকে উইশ করত, নেক্সট টাইম ইন জেরুজালেম। জীবনের প্রথম অনেকগুলো বছর, মাটি খুঁড়ে চলার ফাঁকে ফাঁকে, নিজেকে অন্যকে এইরকম জেরুজালেম দেখাতাম আমিও। তারপর, উনিশশো বিরানববই-এর সাতই জানুয়ারি, ক্রেমলিনের মাথা থেকে লাল পতাকা নামিয়ে নেওয়া হল। আমার জেরুজালেম?

এর মধ্যেই, আজ চবিবশে ডিসেম্বর লেখাটা শেষ হচ্ছে, আমেরিকা ব্রিটেন তার আক্রমণ তুলে নিয়েছে, এবং জানিয়েছে, দরকার হলে তারা আবার আক্রমণ করবে। থ্রেটটা ঝুলে রইল।

নানা ধরণের থ্রেটের ভিতর বসবাসের ব্যাকরণ শিখছি, ট্রেঞ্চ খোঁড়া আর হল না তো হায়, তাই লিখি করে ঘাড় নিচু। ঘাড় হেঁট হেঁট, আরো কত হেঁট করব?

আমেরিকা আমার চারপাশে ছড়িয়ে থাকে, টুকরো টুকরো। কোন টুকরোটা তার থেকে আমি আলাদা করি? — এটা আমেরিকা, ওটা আমেরিকা নয়। সবই তো অতিনির্নীত। রানুর ছেলে মাটি খুঁড়ছে, বাণীদার দাদার প্রাসাদে আমেরিকা ফেরত নাতনির প্রেত খিলখিল হাসির ঝর্না ফোটায়, আমরা ডাকি বারবার ডাকি, সাড়া দেয়না। আমি বর্ননা করছি, করেই চলেছি। আমার আরাম হচ্ছে।